নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো... গল্প জেতো ২০০৫

শিশুদের মেধা এবং সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক ২০০০ এবং নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথভাবে 'নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো... গল্প জেতো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে গত ৫ বছর ধরে। প্রথম বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে গল্প জমা পড়েছিল ১ হাজার ৬৩৭টি। আর এ বছর এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৩৬৭টিতে। ১ সেপ্টেম্বর ছিল গল্প জমা দেয়ার শেষ দিন। নির্ধারিত সময়ের পরেও গল্প এসেছে ৫৯৩টি। গত ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় জাদুঘরের জিয়া মিলনায়তনে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঘোষণা অনুযায়ী গতবারের ধারাবাহিকতায় 'ক' ও 'খ' বিভাগ থেকে মোট ১২০টি গল্প নির্বাচিত হয়। এর মধ্যে 'ক' ও 'খ' বিভাগ থেকে মোট ২০টি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। বিশেষ পুরস্কার হিসেবে দুই বিভাগ থেকে মনোনীত হয়েছে বাকি ১০০টি গল্প। এ বছর বিচারক ছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, কথাসাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের এবং জুবাইদা গলশান আরা।

নুজহাত তাহলির নাওমি
প্রথম 'খ' বিভাগ

লাবীব মুনতাসীর
প্রথম 'ক' বিভাগ

নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো... গল্প জেতো ২০০৫ প্রতিযোগিতায় 'ক' ও 'খ' বিভাগ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত সেরা ১০টি গল্প প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদসংখ্যা-২-এ প্রকাশিত হবে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাকি গল্পগুলো।

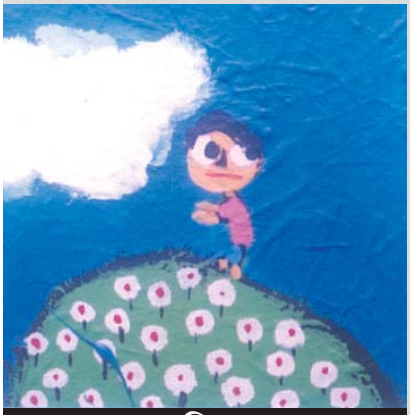

বুড়িমা

লাবীব মুনতাসীর

আবিদ স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তখনই ওর আম্মু এসে বলল তুমি আজই শেষ স্কুলে যাবে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতে। এ কথাটি যে কোনদিন শুনতে হতো জেনেও আবিদের মন খারাপ হল। ওরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। ওর বাবা ঢাকায় চাকরি করেন। তিনি কোয়ার্টার পেয়েছেন। এখন তো যেতেই হবে। আবিদের আনন্দ হবার কথা কিন্তু ও আদৌ খুশি হতে পারল না।

আচ্ছা আম্মু আমরা না গেলে হয় না?

তা কি করে হয়, তোমার আব্বুর কষ্ট হবে।

তাইতো আব্বুর কষ্ট হতে দেয়া ঠিক না। ইস্ চাকরিটা কেন হল? আবিদ ভাবছিল গ্রামেই তো ভালো। ঢাকায় কি আর বুড়িমার মতো বুড়িমা পাওয়া যাবে? ফুল, পাখি, গাছদের সঙ্গে খেলাও যাবে না। সেই ছোট কুকুরটা যাকে বন্ধু বলে ডাকলেই দৌড়ে আসে এসব ছেড়ে যেতে হবে। আবিদ ক্লাসে মনযোগ দিতে পারছিল না। শুধু বুড়িমার কথা মনে পড়ছে।

বিকেল হলেই গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েগুলো ছুটে যায় বুড়িমার বাগানে খেলতে। বাগানটাকে আবিদের রূপকথার রাজ্য মনে হয়। কত ফুল গাছ, কত কত পাখি, রঙিন প্রজাপতি ফুলের মিষ্টি গন্ধ সব মিলিয়ে বাগানটা অপরূপ লাগে। আর আছে অনেকগুলো কুকুর, বেড়াল সবার সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব। খেলাধুলা, হৈ-চৈ পাখির কিচির মিচির কি আনন্দে বিকেলটা কাটে। আবিদের ভীষণ রাগ হয় সূর্যটার ওপর। এতো দ্রুত ডুবতে শুরু করে সন্ধ্যাকে নিয়ে আসে বেশিক্ষণ খেলা যায় না। ওরা প্রতিদিন খেলা শেষে গাছগুলোতে পানি দেয়। পাখির বাসা ভেঙ্গে গেলে নতুন বাসা তৈরি করে দেয়। ওরা কখনও গাছ নষ্ট করে না। ফুল, ফল ছেড়ে না এজন্য বুড়িমা ওদের খেলতে দেয়। প্রতিদিন খেলা শেষে বুড়িমা আচার, ফল, পিঠা কিছু একটা খেতে দেবেই। সপ্তাহে একদিন গল্প শোনা চাই, রাক্ষস, ডাইনি, রাজপুত্রের গল্প কত গল্পই না জানে বুড়িমা, অনেকে হেসে বলে, বুড়ি পারেও বটে। বুড়িমা বলে, আমার বন্ধুরা আছে বলেই তো বাগানটা টিকে আছে।

এই হাসি, আনন্দ শেষ হয়ে যাবে। আবিদের মন এতো খারাপ হল। টিফিন পিরিয়ডে ওর বন্ধুরা এসে বলল, তোর কি মন খারাপ? ও মুখ কালো করে বলল, আমরা আগামী সপ্তাহে ঢাকা চলে যাব। এ কথা শোনার পর সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে দ্রুত দিন চলে গেল। আবিদ আজ চলে যাবে। নাহ্ সময়কে নিয়ে আর পারা যায় না। সূর্যটা একটু ধীরে চললে, রাত দেরিতে ফুরোলেই তো বেশি সময় ওরা থাকতে পারত। আবিদের ইচ্ছে করে সূর্যটাকে যদি বলতে পারত তুমি একটু ধীরে চল না। ঘড়িগুলোও সব পচা টিক টিক করে শুধু বয়েই চলে। আরে বাবা একটু থেমে থাকলে কি হয়। আবিদের শুধু কান্না আসছে ও বুড়িমার জন্য অনেকগুলো ফুল গাছ ঘাসকাটা কল, এবং বল কিনল কুকুর ও বেড়ালগুলোর জন্য। ওর জমানো যা টাকা ছিল তা দিয়ে। আম্মু ওর হাতে বুড়িমার জন্য নতুন একটা শাড়ি দিতেই ও আনন্দে আম্মুকে জড়িয়ে ধরল। আবিদ বন্ধুদের সঙ্গে বুড়িমার কাছে গেল। উপহারগুলো দিয়ে বলল আজ আমরা চলে যাব। তুমি আমার জন্য দোয়া কোরো আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব। তারপর ফিরে আসব। তোমার মতো পশু পাখি গাছদের সেবা করব। গরিবদের ফ্রি চিকিৎসা করব।

অবশ্যই ডাক্তার হবে, ফিরে আসবে। ছিঃ কাঁদেনা লক্ষ্মী ছেলে। আজ পুরো বাগানটাই কেমন বিষণ্ন। ছেলেমেয়েরা খেলছে না। তাই পাখিরা গাইছে না, প্রজাপতি উড়ছে না। তুমি তোমার বন্ধু কুকুরটাকে নিয়ে যাও বুড়িমা বলল। না বুড়িমা ও এখানেই থাক। আমার সঙ্গে গেলে এই বাগান, ফুল পাখি অন্য বন্ধুদের পাবে না। বুড়িমা তখন ওকে ছোট একটা শিউলি ফুলগাছ দিল। আচার ও পিঠা দিল। আবিদের শিউলি ফুল গাছ খুব পছন্দ। ও বুড়িমার হাতের যত্নে গড়ে তোলা ছোট গাছটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে চলল।

লেখক পরিচিতি
লাবীব মুনতাসীর
আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল
শ্রেণী : তৃতীয় শ্রেণী
১৪২, শান্তিনগর, ঢাকা

চড়ুই পাখির ছানা

জান্নাতে সাদিয়া

আমরা আমাদের নিজের বাসায় থাকি। আমাদের পরিবারে আমরা মোট পাঁচ জন। আব্বু, আম্মু, বড় দুই ভাই রাশেদ ও রিফাত ও আমি। আমার নাম রশ্মি। একদিন আমরা সবাই নাস্তার টেবিলে নাস্তা খেতে বসেছি। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বের বারান্দায় ছিল গামছা নাড়া। আমি নাস্তা খেতে খেতে বারান্দায় গিয়েছিলাম গামছা আনতে। দেখলাম ছোট্ট একটি চড়ুই পাখি ঠোঁটে করে একটি খড় নিয়ে বারান্দায় ভিতরে ঢুকলো। আমি দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে আম্মুকে খবরটা দিলাম। আব্বু ও আম্মু বলল, শোন, চড়ুই পাখি খড় দিয়ে বাসা বানাবে, তারপর ডিম পাড়বে, ডিমে তা দিবে, তারপর পাখির ছানা হবে। বাসায় যখন ছানা হবে তখন তুমি বুঝবে পাখির ছানার ডাক কত মজার, তারা কত মিষ্টি ও মজার ডাক ডাকে। তারা কত মিষ্টি করে কিচির মিচির ডাকছে। আর যদি তুমি পাখিগুলোকে ধরতে অথবা বাসা ভাঙতে যাও তাহলে পাখিরা কষ্ট পেয়ে চলে যাবে। তখন তুমি কি করে পাখির ছানার কণ্ঠের ডাক শুনবে?

তারপর আমি ভাবলাম আব্বু-আম্মুর কথাই ঠিক। এরপর দিন যায়, রাত যায় আবার দিন আসে রাত হয় এভাবে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করলাম কিন্তু পাখির ছানার ডাক শুনতে পেলাম না। তখন আমি আব্বুকে বললাম পাখির ছানার ডাকতো শোনা যায় না?

আব্বু বলল আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, তুমি অবশ্যই দেখতে ও শুনতে পাবে।

তারপর আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে থাকলাম। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম পাখির ছানার কিচমিচ মিষ্টি কণ্ঠ। আমি তখন গ্রিল বেয়ে এগিয়ে গেলাম পাখির বাসার কাছে। শুনলাম আরো মিষ্টি কণ্ঠে ডাকছে পাখির ছানা। যতই এগিয়ে যাই ততই মিষ্টি কণ্ঠে ডাকছে পাখির ছানা। কিছুদিন পর আবার সেই একই রকম সবাই সকালের নাস্তা খেতে এসেছে। আমি একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের বারান্দায় ছিল একটি টেবিল। টেবিলটি ছিল ছোট্ট। টেবিলের ওপর ছিল একটি গ্লাস। গ্লাসটি রেখেছিলাম আমি কারণ ফুল রাখব বলে। গ্লাসটি পানি দিয়ে পূরণ করে রেখে ফুল আনতে গিয়েছিলাম আম্মুর কাছে। এসে দেখি বারান্দায় পাখির ছানা উড়াউড়ি করছে। তাই দেখে আমার যে কি আনন্দ লাগল। আমি ফুলটি রেখে আসলাম আম্মুর কাছে। এর একটু পরে যেয়ে দেখি ছোট্ট পাখির ছানা পানি ভর্তি গ্লাসের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি দেরি না করে তাড়াতাড়ি উঠালাম পাখির ছানাকে। আমি ভাবলাম এই চড়ুই পাখির একটাই ছানা যদি মারা যেত তাহলে ছানার মা পাখিটি খুব কষ্ট পেত এবং চলে যেত। আমি আব্বু আম্মুকে দেখালাম এবং ঘটনাটি বললাম। আব্বু বলল পাখির ছানাকে বারান্দায় এক কোণে রেখে দাও। আমার খুব কষ্ট লেগেছিল। তারপর যখন রেখে দিলাম তখন দেখলাম পাখির ছানা খুব সুখে আছে। আমি ঠিক বারটায় স্কুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে দেখি পাখির মা তার ছানাকে নিয়ে গেছে। কিছুদিন পর পাখির ছানা আবার দুর্বল হয়ে শুয়ে আছে বারান্দার এক কোণে। আমি আর ওকে ধরলাম না। আরও কিছুদিন পর দেখলাম পাখির ছানা তার মা-বাবাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এভাবে সবাই একদিন সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে। এটাই মনে হয় পৃথিবীর নিয়ম।

লেখক পরিচিতি
জান্নাতে সাদিয়া
লাইসিয়াম কিন্ডার গার্টেন
শ্রেণী : তৃতীয়
বগুড়া হাউজ, ২৪/১৭ পল্লবী
মিরপুর, ঢাকা

একটি টিয়া পাখির গল্প

শাফিন মাহমুদ

রাতুলের বয়স নয় বছর। সে চট্টগ্রামে থাকে। একদিন সে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জব্বর আলীর বলী খেলার মেলায় যায়। সেখানে সে একটি সুন্দর টিয়া পাখি দেখে বায়না ধরে তার আব্বু, আম্মুর কাছে পাখিটি তাকে কিনে দেবার জন্যে। কিন্তু রাতুলের আব্বু, আম্মু তাকে টিয়া পাখিটা কিনে দিতে চায় না কারণ তারা দু'জনেই চাকরি করেন। সুতরাং পাখিটাকে কে দেখাশুনা করবে। রাতুল আব্বু আম্মুর নিষেধ মেনে নিলেও দুঃখভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরলো এবং তার বুবুকে (দাদী) সেই টিয়া পাখিটির কথা বললো। রাতুলের বুবু ওর কথা শুনে বললেন 'ঠিক আছে দাদুভাই আমি তোমাকে একটি টিয়া পাখি কিনে দেব এবং আমরা দুজনে মিলে পাখিটির যত্ন করবো কেমন?'

কিন্তু রাতুলের মনে দুঃখ। সে বুবুকে বলে, তুমি কোথায় পাবে টিয়া পাখি?

হঠাৎ করে একদিন একটি ছেলে আসে রাতুলের বাসায় একটি টিয়া পাখি বিক্রি করতে। ওর বুবু ১২০ টাকা দিয়ে ঐ পাখিটি কিনে রাখেন রাতুলের জন্য এবং পাখিটিকে ওদের পুরনো পাখির খাঁচায় ভরে রাখেন। রাতুল স্কুল ছুটির পর বাসায় এসে ঘরে ঢুকতেই বারান্দায় একটি সুন্দর টিয়া পাখি খাঁচার ভিতর দেখতে পায়। ও অবাক হয়ে দৌড়ে গিয়ে বুবুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে ওর বুবুই পাখিটি ওর জন্যে কিনে রেখেছেন। রাতুলের আনন্দ আর ধরে না। ও বুবুকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে বলে ওঠে Grand ma, Grand ma, are you old? papa told me old is gold. দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে এবং পাখিটিকে দেখার জন্য বারান্দায় চলে আসে।

এরপর রাতুল ও তার বুবু মিলে প্রতিদিন পাখিটাকে খাবার দেয়, গোসল করায়। রাতুলের সে কি আনন্দ! পাখিটিও ওকে দেখলে লেজ নাড়ায়, কিচিরমিচির করে। রাতুল পাখিটিকে জিজ্ঞাসা করে 'Are you happy? Do you like me'?

একদিন রাতুলের চাচা পিকনিক করে আসার সময় একটি টিয়া পাখি নিয়ে এলো এবং পুরনো টিয়া পাখিটির সঙ্গে রাখলো। দুইটি পাখি এখন মনের আনন্দে একজন আরেকজনকে খাবার খাওয়ায়, গায়ে গা ঘষে, দুজনে মিলে এক সঙ্গে গোসল করে। রাতুল দেখে আর হাসে। হঠাৎ করে একদিন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে ওর চাচার আনা পাখিটি উড়ে চলে যায়। এরপর থেকে মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে থাকে, খাবার খায় না। রাতুল অনেক চেষ্টা করে পাখিটিকে খাওয়াতে কিন্তু পাখিটি খাবার খায় না। আগের মত কিচিরমিচির করে না, লেজও নাড়ে না। রাতুল ওর বুবুকে বলে নতুন পাখিটি উড়ে যাবার পর থেকে ওর পাখিটির মন খারাপ। ও পাখিটির মন খারাপের কথা ওর আব্বু আম্মুকেও বলে। রাতে ও ঘুমাতে গিয়ে ওর আম্মুকে বলে, আম্মু পাখিটিকে আমি যদি ছেড়ে দেই তাহলে কি সে তার আব্বু আম্মুর কাছে ফিরে যেতে পারবে? ওর আম্মু ওর মুখে পাখিটি ছেড়ে দেবার কথা শুনে ওবাক হন। রাতুল আরো বলে তুমি আর আব্বু যখন অফিসে থাকো, অনেকক্ষণ আমি তোমাদেরকে দেখি না, তখন আমার অনেক মন খারাপ হয়, শুধু মনে হয় কখন আব্বু আম্মুকে দেখবো। পাখিটিরও সে রকম মন খারাপ করেছে।

পরদিন সকালে সে ঘুম থেকে উঠে বুবুর ঘরে যায়, বুবুকে বলে, বুবু চলো আমরা পাখিটিকে ছেড়ে দেই যাতে করে পাখিটি ওর আব্বু আম্মুর কাছে ফিরে যেতে পারে। ওর বুবু বলেন ঠিক আছে। রাতুল পাখিটিকে ছেড়ে দেয়। পাখিটি পতপত করে দু'ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়, আর লেজ নাড়ায়। রাতুলের চোখ ছলছল করে। সেও হাত নেড়ে বন্ধুকে বিদায় জানায়। ওর আব্বু আম্মু ও বুবু একে অপরের দিকে তাকায়। ওদের চোখও ভিজে উঠেছে।

লেখক পরিচিতি
শাফিন মাহমুদ
লিটল জুয়েলস স্কুল
শ্রেণী : তৃতীয়
৪৬, ফ্লোরা পাস রোড, আমবাগান, চট্টগ্রাম

কাকতাড়ুয়া

অনন্ত সরকার

'আমরা কাল গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাব' বাবা বললেন মাকে। ডাইনিং রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কথাগুলো শুনল জিতু। নিজের রুমে চলে এসে সে ভাবতে লাগল বাবা যদি যান তবে সপরিবারেই যাবেন। এই ভেবে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল জিতু। অবশ্য ওর চিন্তার কারণও আছে। ঘড়িতে সকাল নয়টা। বাবা অফিসে চলে গেলেন। বাবা যাওয়ার পর জিতুর মা জিতুর রুমে ঢুকল। জিতু এরই মধ্যে স্কুলে যাবার প্রস্তুতি প্রায় শেষই করে ফেলছিল। মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মার দিকে মুখ তুলে তাকাল জিতু। মা জিতুকে বলল, 'জিতু কাল আমরা সবাই তোমার বাবার গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি, কতদিন যাওয়া হয়নি তাই আজ তোমার স্কুলে যেতে হবে না। তিন চারদিন থাকার প্রস্তুতি নাও।' জিতুর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। জিতু গ্রামকে মোটেও পছন্দ করে না। কিন্তু কে বোঝাবে মাকে। গ্রামে না আছে বিদ্যুৎ, না আছে এই শহরের মতো দালান কোঠা। আর তাছাড়া ভূত নামক বিকট ভয়ানক জিনিসটা তো আছেই। গ্রামে গেলে টিভির কার্টুন টম এ্যান্ড জেরি কিভাবে দেখবে এই সেই ভেবে তার পুরা দিনটি গেলো। বিকেলে বাবা অফিস থেকে ফিরতেই জিতু বাবাকে গ্রামে না যাওয়ার জন্য বলল। বাবা বললেন, 'আজ পাঁচ বছর যাবৎ যাওয়া হয় না, তাছাড়া মার শরীরটাও বেশ ভালো না তাই কিছু পাওনা ছুটি এক সঙ্গে পাওয়াতে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি। অগত্যা জিতু কিছু না বলে নিজের রুমে গিয়ে জামা কাপড় ব্যাগে ভরতে লাগল।

সকালে গাড়িতে চড়ে রওনা হল গ্রামের দিকে। সঙ্গে ড্রাইভার চাচা আশরাফ। সেও প্রায় গ্রামে না যাওয়ার জন্য অনিচ্ছুক। তিন ঘন্টার মধ্যে একটানা জার্নিতে পৌঁছে গেল ওরা। রাতে জিতুর খুব টয়লেট পেল। জিতু ছোট মামাকে সঙ্গে নিয়ে টয়লেট করতে গেলো। গ্রামে এলে জিতু ছোট মামার সঙ্গেই সব সময় থাকে। জিতু টয়লেট করবে এখন সময় ও সাদা জামাপরা এক ভয়ংকর চিত্র দেখে জোরে চিৎকার করে 'ভূত ভূত' বলে ছোট মামাকে জড়িয়ে ধরল। চিৎকার শুনে বাবা মাসহ সবাই ছুটে এসে আসল ঘটনা জানতে পারে ছোটমামা পিকলুর কাছে। সবাই ঘটনা শুনে হাসল। সকালে ছোটমামা জিতুকে হেসে বললেন, 'কাল রাতে যা দেখেছো তা একটা কাকতাড়ুয়া, পাখি যাতে ফসলের কোনো ক্ষতি না করতে পারে সে জন্য এরকম অদ্ভুদ জিনিস আমরা তৈরি করে রাখি যাতে পাখিরা ভয়ে ফসল না খায়। ছোট মামা জিতুকে পুরো গ্রাম ঘুরিয়ে দেখালেন। পাঁচ বছরে পুরো গ্রাম অনেকটা পাল্টে গেছে। জিতুর সবচেয়ে ভালোলাগে কাকতাড়ুয়াকে। ছোটমামা আর জিতু দুজনে মিলে একটা বিশাল বড় কাকতাড়ুয়া তৈরি করে প্রায় সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। জিতু তো প্রায় গ্রাম ছেড়ে যেতেই চায় না। পারলে আরো অনেক দিন থেকে যায়। এদিকে বাড়িতে চলে আসার সময় হয়ে গেছে। জিতু যখন গাড়িতে উঠেছে তখন তার বানানো কাকতাড়ুয়াটি ফসলের মাঠে বাতাসে দুলছিল তখন জিতুর যে কি আনন্দ হলো।

জিতুর চোখে কেবলই কাকতাড়ুয়ার ছবি ভেসে উঠতে লাগল। গাড়ি মেঠো পথে ধূলো উড়িয়ে চলছে। জিতু কেবলই পিছনের দিকে তাকিয়ে আছে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় কাকতাড়ুয়া।

লেখক পরিচিতি
অনন্ত সরকার
নারায়ণগঞ্জ প্রিপারেটরি স্কুল
শ্রেণী : চতুর্থ
১৮৬ প্রেসিডেন্ট রোড (চাষাঢ়া)
নারায়ণগঞ্জ

পুতুলের বিয়ে

মোঃ নোমান মাহমুদ

সর্বমোট পাঁচশত বিরাশি টাকা। উমানা এ নিয়ে তিনবার গুনল। ওর ভীষণ খুশি লাগছে। এ টাকাটা জমাতে তিন মাস লেগেছে। এমনকি এবার জন্মদিনে ও কারো কাছ থেকে গিফট্ পর্যন্ত নেয়নি। আব্বু-আম্মুকে বলেছে, দিতে চাইলে টাকা দিবে। অবশেষে ওর স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। পুতুলটাও কিনতে পারবে। স্কুলের পাশের দোকানটাতে সুন্দর একটা ছেলে পুতুল দেখেছে ও। ব্যাটারি দিলে গান গায়, কথা বলে। ওদের পাশের ফ্ল্যাটে ইমার পুতুলটা ওরকম। ইয়ার পুতুলটার নাম জয়। উমানার একটা মেয়ে পুতুল আছে। নাম বৃষ্টি। ও বলেছিল, জয়ের সঙ্গে বৃষ্টির বিয়ে হোক। ইমা রাজি হয়নি। তার জয় অনেক দামী, স্মার্ট পুতুল। বৃষ্টি কমদামী, অত সুন্দর নয়। উমানা খুবই কষ্ট পেয়েছে ইমার কথায়। তারপর থেকে ও টাকা জমানো শুরু করেছে। পাঁচশত টাকা দিয়ে পুতুল কিনে দেবে, এত টাকা উমানার বাবা-মার নেই। এ জন্য ও আম্মুকে বলেওনি।

অবশেষে ও পুতুলটা পাবে। ও ঠিক করল পুতুলটার নাম হবে হৃদু। এখন শুধু অপেক্ষা। ভাইয়া আসলেই তাকে নিয়ে কিনতে যাবে। তারপর বৃষ্টির সঙ্গে বিয়ে দেবে। উমানা ভাবতে বসল বিয়েতে কাকে কাকে Invite করবে। আম্মু দাদুবাড়ি গিয়েছে। দু'দিন পরই চলে আসবে। আব্বু, আম্মু, ভাইয়া, ওর বান্ধবীদের আর ইমাকে তো অবশ্যই। ইমা ওর বৃষ্টিকে পচা বলেছে। জয়ের মত পুতুল ওরও থাকতে পারে সেটা ইমাকে দেখাতে হবে। পুতুলটা কিনতে ৪৪০ টাকা লাগবে। বাকিটা দিয়ে খাবার কিনবে। আম্মুও নিশ্চয় ওকে কিছু খাবার তৈরি করে দেবে। বুয়ার মেয়ে সালমার কথা মনে পড়তেই উঠে দাঁড়াল। বুয়াকে বলবে সালমাকে নিয়ে আসতে। রান্নাঘরে এসে অবাক হয়ে গেল। বুয়া চুপিচুপি কাঁদছে। বুয়া কখনও কাঁদে না। সারাক্ষণ হাসিখুশি। উমানার মন খারাপ হয়ে গেল। বুয়া ওকে আদর করে। বুয়াকে ও খুবই পছন্দ করে।

বুয়া কাঁদছো কেন? ও জানতে চাইল।

বুয়া কোনো কথা বলল না। কিন্তু উমানার জানতেই হবে বুয়া কেন কাঁদে। ও দাঁড়িয়েই রইল শোনার জন্য। অবশেষে কান্না থামিয়ে বুয়া বলল, তার মেয়ে সালমার স্কুলে তিন মাসের বেতন বাকি। সালমা এবার ফাইভে পড়ে। তার খুব ইচ্ছে ছিল সালমা বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। ও পড়াশোনায় ভাল। বৃত্তি দিলে হয়তো পাবে। কিন্তু বেতন না দিতে পারলে ও আর স্কুলেই যেতে পারবে না। কত টাকা লাগবে সব মিলিয়ে? উমানা জানতে চাইল। ৪৮০ টাকা। তোমার আম্মু থাকলে নিতে পারতাম। এত টাকা কই পাই। কালকের মধ্যে টাকা দেয়া লাগবে।

তা ঠিক, আম্মু থাকলে টাকা দিত। উমানার খুব ইচ্ছে করল বুয়ার জন্য কিছু করতে। এত টাকা কোথায় পাবে ভাবতেই ওর মনে পড়ল ওর কাছে টাকা আছে। কিন্তু ওটা কত কষ্ট করে জমিয়েছে পুতুল কিনবে। টাকাটা দিলে পুতুল কেনা হবে না। তবে সালমা স্কুলে যেতে পারবে। বৃত্তি দিতে পারবে। ওর যেমন স্কুলে যেতে খুব ভাল লাগে। সালমারও তো ভাল লাগে। অনেক ভেবে অবশেষে পাঁচশ টাকা বুয়াকে দিয়ে দিল।

এ টাকাটা নাও। আমি জমিয়েছিলাম।

বুয়া নিতে চাচ্ছিল না। ও জোর করে দিল। ওর একটুও কষ্ট হল না। সালমা স্কুলে যেতে পারবে এটা ভেবে ভাল লাগল।

এরপর অনেক দিন চলে গেছে। উমানাকে ওর খালামণি সুন্দর একটা ছেলে পুতুল কিনে দিয়েছে ও সালমাকে টাকা দিয়েছে শুনে। আজ পুতুলের বিয়ে। ওর বন্ধুরা এসেছে। সালমাও এসেছে। ও সবার সামনে বললো, আমাদের কাজের বুয়ার মেয়ে সালমা বৃত্তি পেয়েছে। সবাই অবাক হয়ে গেল। বুয়া বলল, সালমা বৃত্তি পেয়েছে উমানার কারণে। উমানা টাকা না দিলে পরীক্ষাই দিতে পারতো না। বুয়া আজ শুধুই কাঁদছে। উমানা বলল, তুমি কাঁদ কেন? বৃত্তি পেলে হাসতে হয়। উমানার কথায় বুয়া হেসে দিল।

কি আশ্চর্য! মানুষ কি একই সঙ্গে হাসতে এবং কাঁদতে পারে! কি জানি, বড়দের কর্মকাণ্ড উমানার কাছে সব সময়ই অদ্ভুত মনে হয়।

লেখক পরিচিতি
মোঃ নোমান মাহমুদ
আইডিয়াল টিউটোরিয়াল হোম
৩৩৮/বি, পূর্ব নাখালপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা